দুর্নীতি-অনিয়মই উপাচার্যের নিয়মনীতি

ড. মতিউর রহমান পলাশ, ড. তুহিন ওয়াদুদ, আপেল মাহমুদ
রুহুল আমীন, আমিনুর রহমান, শামসুল হক

উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় যখন উত্তাল তখন উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. আবদুল জলিল মিয়া নিজস্ব পেটোয়া ও বহিরাগতদের দিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে কলংকজনক কাজটি করালেন। আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা, ভাংচুর ও এসিড নিক্ষেপ করার মতো ঘৃণ্য কাজও তিনি করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে পরিমাণ দুর্নীতি করেছেন, তা এই স্বল্প পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না। উপাচার্যের দুষ্টপাটনীতির কারণে শিক্ষা বিকাশের সম্ভাবনা মুখ থুবড়ে পড়েছে। দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. মু. আবদুল জলিল মিয়া দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই নিয়োগ উৎসবে মেতে ওঠেন। তার আত্মীয়স্বজন আর নিজ উপজেলার লোকজনকে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে ভরে তোলেন বিশ্ববিদ্যালয়। তার যোগদানের মাত্র চার মাস পর ২০০৯ সালের ২০ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকে (প্রথম আলো) 'এটি একটি পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়' শিরোনামে দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়। পরদিন সম্পাদকীয় লেখা হয়। কিন্তু তার অন্যায়ের শাস্তি না হওয়ার সুযোগে উপাচার্য সব রকম অনিয়ম আর দুর্নীতি করতে থাকেন। 'রাষ্ট্রের টাকায় পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে'র পরিসর দিনের পর দিন তিনি বৃদ্ধি করেছেন— যেমন তার এক ছোট ভাইকে তিনি চাকরি দিয়েছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী পদে। এক বছরের মধ্যেই দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের সনদ দিয়ে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি দেন। তার পরিবারের এখন শাখা-প্রশাখা-উপশাখা-অনুশাখা মিলে সদস্য সংখ্যা কত হবে, তা অনুমান করে বলা কঠিন। কারণ প্রায় প্রতিদিনই চলে নিয়োগ। তার চাকরির মেয়াদ আছে আরও প্রায় তিন মাস। তাই উপাচার্য গণনিয়োগে মেতে উঠেছেন। তার আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা বিশের নিচে তো নয়ই, চল্লিশ কিংবা পঞ্চাশও হতে পারে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপউপাচার্য তার স্ত্রীর নিয়োগের সময় বোর্ডে সভাপতিত্ব করেছিলেন বলে তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের মেয়ে, ভাই, ভায়রা, ভাতিজাসহ যত আত্মীয়ের নিয়োগ হয়েছে তার সবগুলো নিয়োগ বোর্ডে তিনি সভাপতিত্ব করেছেন।

উপাচার্যের সীমাহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক তদন্তে উপাচার্যের দুর্নীতির সত্যতার প্রমাণ মিলেছে। এ কারণে ২৮ জানুয়ারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সব নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু তিনি ২৮ তারিখের আগের তারিখ দেখিয়ে দু'শতাধিক নিয়োগ দিয়েছেন মর্মে ২ ফেব্রুয়ারির যুগান্তরে খবর প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু তার দুর্নীতি প্রমাণিত, তাই তাকে দ্রুত অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরি।

২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল সংসদে পাসকৃত ২৯ নং আইন দ্বারা এ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয়। এ আইনের অনেকগুলোই তিনি ভঙ্গ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৯(১) ধারা অনুযায়ী বছরে একবার করে সিনেট সভা হওয়ার কথা। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরে একবারও সিনেট সভা আহ্বান করেননি। সিন্ডিকেটে একজন অবৈধ সদস্যকে তিনি রেখেছেন তার সুবিধার্থে। ড. সৈয়দ শামসুজ্জামান আরডিআরএস নামক একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থায় চাকরি করতেন। চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন ছয় মাসের বেশি আগে। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ২১(৪) ধারা অনুযায়ী তিনি চাকরি থেকে অব্যাহতি নেয়ার পর থেকে আর সিন্ডিকেট

সদস্য হিসেবে থাকতে পারেন না। কিন্তু এখনও তিনি সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন এবং অনেক নিয়োগ বোর্ডের সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। ২৬(৫) ধারা মোতাবেক কোন অনুষদের ডিন হবেন ওই অনুষদের জ্যেষ্ঠতম অধ্যাপক, অধ্যাপক না থাকলে সহযোগী অধ্যাপক। উপাচার্য এই আইন লংঘন করে দু'জন জ্যেষ্ঠকে ডিঙিয়ে তার আপন ভায়রাকে বিজ্ঞান অনুষদে ডিনের দায়িত্ব দেন। যখন তার ভায়রার পদোন্নতি হয়েছিল, তখন তিন ভায়রা নিয়োগ বোর্ডে ছিলেন। একজন ছিলেন বিষয় বিশেষজ্ঞ, একজন উপাচার্য, অন্যজন প্রার্থী। ২৭(১) ধারায় বলা হয়েছে 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনবোধে মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে চ্যান্সেলর কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে, নারী উন্নয়নে গবেষণা কার্য পরিচালনাসহ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার অঙ্গীভূত ইন্সটিটিউট হিসেবে এক বা একাধিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করতে পারবে বা, ক্ষেত্রমত ওই বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন ইন্সটিটিউটকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।' এ আইন লংঘন করে বিশ্ববিদ্যালয় Northbengal Institute of Development Studies (NIDS) নামের একটি নব্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ প্রতিষ্ঠানটি মূলত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সরল সংস্করণ মাত্র। শিক্ষাবাণিজ্য করার জন্যই তিনি এ কাজটি করেছেন। প্রতিষ্ঠানটিতে তার নিজের এবং মেয়ের মালিকানা রয়েছে। সেই সঙ্গে মালিকানা রয়েছে সিন্ডিকেটের অবৈধ সদস্য ড. সৈয়দ শামসুজ্জামানের। প্রতিষ্ঠানটিতে কৃষি ও চিকিৎসা বিষয়ে কোর্স খোলা হয়েছে। অথচ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন চিকিৎসা ও কৃষি অনুষদ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন পর্যন্ত দর্শন বিভাগ খোলা হয়নি। তারপরও দর্শন বিভাগের একজন শিক্ষক নিয়োগের জন্য তিনি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন।

প্রায় এক বছর হতে চলেছে অর্ধকোটি টাকার বই কেনার জন্য টেন্ডার হয়েছে। কিন্তু সেই বই এখন পর্যন্ত কেনা হয়নি। হলের কাজ এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি। অথচ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ারও সময় পার হয়ে গেছে। হলে প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক সবই নিয়োগ হয়েছে দীর্ঘদিন হল। বিভাগগুলোয় 'সেমিনারের ব্যবস্থা না করেই সেমিনার সহকারী নিয়োগ করা হয়েছে অনেকদিন আগেই। অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, গ্রন্থাগারিক পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়নি। উপাচার্য যাদের আবেদন করার যোগ্যতা নেই এমন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। পরে শর্ত শিথিল করে তাদের স্থায়ী নিয়োগ দেয়া হয়।

এসব অন্যায়ের প্রতিবাদে সচেতন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা শক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এই তিন হাজারের মধ্যে প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী উপাচার্যকে অপসারণের জন্য গণস্বাক্ষর দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের শপথ নিয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলনের মাঠ ছাড়বেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ প্রগতিবাদী আন্দোলনকারীদের ভাষায়াত, বিএনপি বলে ভিন্ন খাতে নেয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সচেতন শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনড় তাদের দাবিতে।

লেখকগণ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তা